এম.এ. চতুর্থ সেমেস্টার (বাংলা)

" কথাসাহিত্য বিশেষ পত্র "

" নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় "

- নামের যাথার্থ্য,
- সমাজ-দেশ-কাল, – জন্ম-মৃত্যু-প্রেম-এর মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির সর্বজনীনতা,
- দেশ ভাগ, ভিটে ছাড়ার কষ্ট, মানুষের বেদন, মৃত্যুর যন্ত্রণার ভিতর ও উজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি,
- হিন্দু হোক বা মুসলমান – চরিত্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কে ও সম্প্রীতির ছবি আঁকা,
- বাঙালির জাতীয় জীবনের সংকটের চিত্র,
- উপমহাদেশের বিভেদ – চিরন্তন নিসর্গের সমান্তরালে মনুষ্যত্বের জয়,

সহায়ক হিসেবে একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত হলো,

বিকাশকান্তি মিদ্যা

নাকেশ সরকার

প্রবহমান নিসর্গ ও মনুষ্যত্ব : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — এঁদের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাসগুলির পটভূমি গ্রামবাংলা। পরবর্তীকালে বনফুল-নাথ ভাদুড়ী-বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেই পটভূমিকে সম্প্রসারিত করেন বাংলার সীমানা ড়িয়ে বিহারের ভাগলপুর-কাটিহার-পূর্ণিয়া বা দ্বারভাঙা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কিন্তু াধীনতা-পরবর্তী কালে বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে কলকাতা বা র পার্শ্ববর্তী মফঃস্বল শহরাঞ্চলে। সমরেশ বসু-সন্তোষকুমার ঘোষ-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-রেন্দ্রনাথ মিত্র-রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস রচনার বেশির ভাগটাই কলকাতা-কেন্দ্রিক। তিক্রম নিশ্চয়ই আছে। সমরেশের 'গঙ্গা'-'টানাপোড়েন'-'বাঘান', রমাপদ-র 'বনপলাশির বলী', সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' বা বিমল করের 'খড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ'-র কথা অবশ্যই নে পড়বে। কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনবৃত্তের মধ্যে একালের ঔপন্যাসিকরা কিছুদিন াগে পর্যন্ত ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারই মধ্যে কেউ কেউ লে-আসা অতীত জীবনের সন্ধান করতে উৎসাহী হয়েছেন, আর তার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে', প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' বা তীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র মতো ভিন্নস্বাদী উপন্যাস। কলকাতা শহর কে দূরে পুববাংলায় এই উপন্যাসগুলির পশ্চাৎপট, ঘটনাকালের দিক থেকেও এরা আছে চনার সমসময় থেকে কিছুটা পিছিয়ে। দেশবিভাগজনিত অনিশ্চয়তা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের নাপোড়েন দুই বাংলার সাধারণ মানুষকে সেদিন যে উদ্বেগের মধ্যে এনে ফেলেছিল — ল্লিখিত উপন্যাসগুলিতে রয়েছে তার প্রতিফলন।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (প্রথম খণ্ড — এপ্রিল ১৯৭১; দ্বিতীয় খণ্ড — জুলাই ১৯৭১) এই উপন্যাসগুলির মধ্যে নানা কারণে বিশিষ্ট। প্রথমত, এ উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় জীবনের একটি সন্ধিক্ষণকে ধরার চেষ্টা রয়েছে। ১৯৩০ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় তিরিশ বছরের বাঙালি জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র আমরা এখানে খুঁজে পাই। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের আভাস অত্যন্ত বাস্তবসম্মত উপায়ে লেখক এ উপন্যাসে তুলে ধরতে পেরেছেন। সর্বোপরি জন্মভূমির প্রতি বা নিবিড় মমতা ও ভালোবাসার টান লেখকের কলমে শিল্পরূপ লাভ করেছে, তা এক কথায় অদ্বিতীয়।

উপন্যাসটির গড়নে কোনো চাতুর্য বা মারপ্যাঁচ নেই। প্রথাগত পদ্ধতিতে বিবৃতিধর্মী রীতিতে উপন্যাসের কাহিনী এগিয়ে চলেছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ধানক্ষেত, পাটজমি, গাছগাছালি, খালবিল, নদী, চর, পাখপাখালির ডাকে মুখর গ্রামজীবন — হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভালোবাসা-ঘৃণা-সংশয়ে বিদ্ধ সম্পর্কের কথা রয়েছে এ উপন্যাসের একদিকে, অন্যদিকে আছে ব্যক্তি মানুষের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা-অন্বেষণ আর ব্যর্থতাবোধের কান্না। উপন্যাসের শুরু ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তা চন্দ্রনাথের ছেলে সোনার জন্মসংবাদ দিয়ে। "আঘুনের শেষবেলাতে" তার জন্ম। সোনার চোখ দিয়েই মূলত লেখক উপন্যাসের ঘটনাধারাকে বর্ণনা করেছেন। বাল্য কৈশোর পেরিয়ে সোনা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করে, শুরু হয় তার জীবনযুদ্ধ — সেখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। কিন্তু এ উপন্যাস নির্দিষ্ট কোনো একজন মানুষ বা পরিবারের কাহিনী নয়। সোনা, তার পরিবার ও সম্পর্কিত দুটি গ্রামকে অবলম্বন করে মূল কাহিনীস্রোত প্রবাহিত হলেও এ উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র পুববাংলা। সোনার জন্ম এক ক্রান্তিলগ্নে — পরাধীন অখণ্ড বাংলা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে চঞ্চল হয়ে উঠছে, বাংলার সাধারণ মানুষ যখন ক্রমশ তাদের আত্মপরিচয় অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠছে, আর সেই সুযোগে কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দল তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরির ফন্দি এঁটে চলেছে, যার পরিণামে দেশ হবে খণ্ডিত, চিরকালের মতো ভিটেছাড়া হবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। উপন্যাসটির কেন্দ্রে আছে রাইনাদী গ্রামের ঠাকুরবাড়ি, গ্রামের এক অতি সম্মানিত পরিবার। পরিবারের কর্তা মহেন্দ্রনাথ অশীতিপর এক বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী শশীবালা : চার পুত্র — মণীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ; দুই পুত্রবধূ — বড়বৌ আর ধনবৌ ; তিন পৌত্র — লাল্টু, পল্টু, সোনা এবং এক পৌত্রী — ছবি। মহেন্দ্রনাথ সেই অঞ্চলের একজন সদাশয় পুরুষ। জীবনে কখনো কোনো মিথ্যাচরণ করেন নি বলে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। একসময় তাঁদের বাড়িতে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হতো। কিন্তু তাঁর বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় পূজা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। একবারই মাত্র তিনি মিথ্যার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মণীন্দ্রনাথ পলিন নামে এক বিদেশিনীর প্রণয়াসক্ত হলে অস্থির মহেন্দ্রনাথ তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য মিথ্যা তার করিয়ে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই মণীন্দ্রনাথ উন্মাদ হয়ে যান। সেজন্য বড়বৌ-এর কাছে অপরাধী হয়ে থাকেন তিনি। বড়বৌ-এর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখে অনুশোচনায় তিনি বলেন — 'বৌমা, তুমি অন্ততঃ বিশ্বাস কইর, মণি তোমার বিয়ার আগে পাগল হয় নাই। জাইনা শুইনা আমি পাগলের সঙ্গে তোমারে ঘর করতে আনি নাই।' (পৃ. ৪৫, ১ম খণ্ড) বৃদ্ধ জানেন, সারা জীবন একটা আদর্শকে ধরে রাখতে গিয়ে জীবনটা তাঁর ঘুলিয়ে গেল, তাই

জীবনের অস্তগামী আলোয় তাঁর উপলব্ধি — 'পদ্মপুরাণ ত আমি নিজেই। মাগো — সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগরের পাঠ করছি, তুই বেহুলার। ... বৌমা, তুমি আমার সতী সাবিত্রী। তুই আমার বেহুলা।' ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া, জীবনের কাছে পরাভূত এক সৎ মানুষ মহেন্দ্রনাথ।

মহেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে পাস করেছিলেন। কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করতে শুরু করেন। কর্মক্ষেত্রে পলিনের বাবার অধস্তন ছিলেন তিনি — সেই সূত্রেই এই বিদেশিনী তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং প্রণয়। কিন্তু বাবা মহেন্দ্রনাথের পাঠানো মিথ্যা তারের ডাকে তিনি বাড়ি ফেরেন, বিবাহ করেন। বড়বৌ বিয়ের সময় দেখেছিল — 'অশান্ত পুরুষ, জীবন থেকে যেন তাঁর সোনার হরিণ হারিয়ে গেছে — মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন, অভিশাপ দেবার বাসনা যেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি এই লাবণ্যময়ীকে এবার গিলে খাবেন।' (পৃ. ৫৬/১ম খণ্ড) ধীরে ধীরে, পাগল হয়ে গেলেন মণীন্দ্রনাথ। সকলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলেন তিনি, মুখে শুধু একটাই শব্দ — 'গ্যাৎচোরেৎশালা'। এই জীবন থেকে পালাতে মাঝে মাঝেই তিনি নিরুদ্দেশে চলে যান। হাঁটতে হাঁটতে যেন খুঁজতে থাকেন নিজের হারানো অতীতকে। পলিনের স্মৃতি, বোটানিক্যাল গার্ডেন্স-এর শান্ত ছায়া, ফোর্ট উইলিয়মের র‍্যামপার্ট — সব যেন ছায়ার পাখি হয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়, তিনি কোনোমতেই ধরতে পারেন না। পাগল হলেও গ্রামের মানুষ তাঁকে পীর বলে ভাবে — শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এই মানুষের কাছে জাতবিচার নেই — হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁকে 'বড়ভাই' বলে ডাকতে পারে। ফতিমা নিজের হাতে তাঁর মুখে মিষ্টি তুলে দিতে পারে — মণীন্দ্রনাথও জালালির শব এক ডুবে তুলে আনতে পারেন নদীর নীচের লতাগুল্ম ভেদ করে। কোনো মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। অথচ সেই মানুষটারই মৃত্যু হয় অপঘাতে — প্রতিশোধকামী ফেলু শেখের নৃশংস হাতের ভারী পাথরের আঘাতে।

ভূপেন্দ্রনাথ সংসারের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক পুরুষ। 'প্রথম বয়সে ভূপেন্দ্রনাথের কিছু আদর্শ ছিল। এখন আর তা নেই। স্বাধীনতা আসবে, স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন চোখে ভাসত। কিন্তু বড়দা পাগল হয়ে গেল — এতবড় সংসার শুধু জমি এবং যজমানিতে চলে না, ভূপেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেল। বুড়ো মানুষটার জন্য, এত বড় সংসারের জন্য সে পায়ে হেঁটে নতুন ধানের ছড়া আনতে চলে গেল। সংসারে তাঁর জীবন প্রায় এক উৎসর্গীকৃত প্রাণ যেন। বিবাহ করা হয়ে উঠল না। চন্দ্রনাথকে বিয়ে দিল; এখন শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দেশে চলে আসা এবং বুড়ো মানুষটার পাশে সংসারের গল্প, জোতজমির গল্প, কোন জমিতে কোন ফসল দিলে ভাল হবে — এমন সব পরামর্শ। মনেই হয় না মানুষটার জীবনে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।" (পৃ. ৪৯/প্রথম খণ্ড)

ভূপেন্দ্রনাথ মুড়াপাড়ার জমিদারদের ম্যানেজার, সেই সংসারের সুখদুঃখের শরিক। কালীবাড়ির পাশে পরিত্যক্ত মসজিদে যখন আবার মুসলমানদের নমাজ পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিল লীগের উৎসাহে, তখন রায়টের আশঙ্কায় প্রশাসনিক সহায়তা নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথ সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করেছিলেন। তাতে তাঁর বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমশই সময় হয়ে উঠল কঠিনতর। ভূপেন্দ্রনাথের কথা থেকেই জানা যাচ্ছে হাটে কাপড় পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারপর দেশজোড়া দাঙ্গা এবং দেশভাগ। ভূপেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল — সদ্যগঠিত পূর্বপাকিস্তানে আর মানসম্মান নিয়ে নিরাপদে থাকা যাবে না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত

নিলেন জমিজায়গা ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে দেশত্যাগ করবেন। অথচ বাড়ির 'এক একটা টিন যখন খুলছে তখনই মনে হচ্ছে ভূপেন্দ্রনাথের এক একটা পাঁজর বুক থেকে কেউ তুলে নিচ্ছে।' (পৃ.২৩৮/২য় খণ্ড) দেশ ছেড়ে চলে যেতে বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবু তিনি ছোটভাই শচীন্দ্রনাথকে বলেছেন — 'গঙ্গার পারে অনাহারে মরলেও শান্তি। তোমরা অন্তত এই শরীরটা গঙ্গার পারে দাহ করতে পারবা।' (পৃ. ২৩৬/২য় খণ্ড) উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা জানতে পারি, ভূপেন্দ্রনাথের গঙ্গা স্নানের কথা — 'শীতের সকালে হেঁটে হেঁটে এক ক্রোশের মতো পথ চলে যান গঙ্গা স্নান করতে। নদীর নামেই তাঁর যত পুণ্য। সংসারের প্রতি মনে হয় মায়া মমতা তাঁর কম। এখানে এসে যে এই বয়সে কি করবেন ভেবে না পেয়ে কেবল বাড়িটার চারপাশে নানারকমের গাছ এনে লাগাচ্ছেন।' (পৃ. ২৮৩/২য় খণ্ড) নিজের জায়গা থেকে উন্মূলিত এই দায়িত্বশীল পুরুষের এমন করুণ পরিণতি পাঠকের মনেও দীর্ঘশ্বাস জাগায়।

সোনার বাবা চন্দ্রনাথ খুব সাধারণ মানুষ। প্রতিবেশীদের কাছে তিনি ঠাকুরবাড়ির ধনকর্তা। একান্নবর্তী পরিবারের ছত্রচ্ছায়ায় নিশ্চিন্তে জীবনযাপন তাঁর। পাঁচটি সন্তানের জনক তিনি। মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়িতে চাকরি করতেন তিনি। কিন্তু দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলা ছেড়ে এসে তিনিই হলেন পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। ততদিনে পাগল মণীন্দ্রনাথ মৃত, ভূপেন্দ্রনাথ সংসারে থেকেও বিবাগী, কনিষ্ঠ শচীন্দ্রনাথ বিবাহের পর পৃথগন্ন — ফলে চন্দ্রনাথের ওপরেই সংসারনির্বাহের সব দায়িত্ব। সোনার কথায় জানা যায়, যে বাবাকে তার যাদুর দেশের লোক মনে হতো, সেই 'বাবার চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। ক্রমে বাবা কেমন হয়ে যাচ্ছেন। তবু বাবাই একমাত্র মানুষ যে বাড়ি ফিরে এলে ওরা ক'দিন দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায়। আবার চলে গেলে সারা সংসারে অন্ধকার।' (পৃ. ২৮৪/২য় খণ্ড)

শচীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র। রাইনাদীর ঠাকুরবাড়ির সংসার সেই সামলে রাখত। ছোটকাকা অনুমতি না দিলে কেউ যে কিছুই করতে পারত না, সে খবর আমরা সোনার কাছ থেকে জানতে পারি। কাকা অনুমতি দিলে তবেই সে মেলা দেখতে যেতে পায়, মুড়াপাড়ার পূজা দেখতে যেতে পায়। অর্থাৎ অন্ধ স্থবির মহেন্দ্রনাথের হয়ে, ভূপেন্দ্রনাথ এবং চন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বাড়ির কর্তা শচীন্দ্রনাথই। তার অন্য একটা পরিচয় — সে সেই এলাকার কংগ্রেসের একজন নেতা। সামসুদ্দিনের কথা থেকে জানা যায় শচীন্দ্রনাথ ভোটেরও একজন প্রার্থী। সামসুদ্দিন বলেছে — 'আমি ভোটে লীগের তরফে খারমু ঠিক করছি। ছোট ঠাকুরের বিরুদ্ধে খারমু।' (পৃ. ১০২/১ম খণ্ড) কিন্তু সামসুদ্দিনকে হারিয়ে শচীন্দ্রনাথই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসী হলেও, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখলেও তার মনের কোণে কোথাও জমাট বাঁধা কুসংস্কারও বিরাজ করত। দেশভাগের প্রাকমুহূর্তে ভূপেন্দ্রনাথ যখন তাঁদের বাস্তুভিটা প্রতাপ চন্দের ছেলেদের কাছে বেচে দিচ্ছেন, তখন দেখা গেল — 'শচীরও তাই ইচ্ছা। দাম কম হলেও এ-বাড়ি সে কখনও মুসলমানের কাছে বিক্রি করতে পারে না। যেন বিক্রি করলেই যেখানে ঠাকুরঘর সেখানে মসজিদ উঠবে, যেখানে মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা বলত ছোট ছোট বালিকারা সেখানে কোরবানি হবে — এইসব ভাবতেই তার চোখে মুখে এক তীব্র ক্ষোভ ফুটে উঠল।' (পৃ. ২৩৭/২য় খণ্ড) মুখে একতার কথা বললেও সেদিন অনেক কংগ্রেস কর্মীর মনে সংস্কার প্রধান হয়ে উঠেছিল, তাদের মনে রাজনৈতিক আদর্শ এবং আজন্মলালিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছিল। কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতার অভাব ছিল না। ফলে শচীন্দ্রনাথের ভাবনাকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলতে পারি আমরা। দেশভাগের পর স্বাধীন ভারতবর্ষে এসে সেই

শচীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক, যৌথ পরিবারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।

এই পরিবারের নারীচরিত্রচিত্রণেও ঔপন্যাসিকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তি লক্ষণীয়। মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী শশীবালা বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী, বড়বৌ তাঁর আজ্ঞাবাহী মাত্র। সংসার চালানোর আসল চাবিকাঠি তাঁর হাতে। শতবর্ষের স্বামীর পিছু পিছু তাঁর বয়সও প্রায় সত্তর ছুঁই-ছুঁই। বিবাহ হয়ে এই সংসারে যখন তিনি এসেছিলেন, তখন তিনি অবোধ বালিকা মাত্র। একদিন স্বামীই তাঁর সব ছিলেন। 'বাপ-মায়ের স্নেহ দিয়ে এই সংসারে এক অখণ্ড প্রতাপশালী মানুষ তাকে বড় করে তুলেছিল। বড় করতে করতে মানুষটা কখন তার অতি আপনার এবং নিজের হয়ে গেল।' (পৃ. ১৬৩/২য় খণ্ড) বুড়ো ঠাকরুণ শশীবালা সদাব্যস্ত। প্রাত্যহিক নিস্তরঙ্গ জীবনযাপেনেই হোক, বা উৎসবে-পার্বণে-বর্ষায় 'নায়রী-বিওড়ি'-রা এলেই হোক তাঁর ব্যস্ততার কোনো সময়-অসময় নেই। তাঁর বড় শখ কুটুমের — বর্ষাকাল এলেই তিনি নায়রীদের জন্য প্রতীক্ষা করেন। 'সারা বর্ষাকাল কুটুম আর কুটুম। ধনবৌ তখন নিশ্বাস ফেলতে পারে না। বড়বৌকে সারাদিন হেঁশেলে পড়ে থাকতে হয়। ... কোন্ কুটুম কোন্ জিনিস খেতে পছন্দ করে — শশীবালার সব মুখস্থ।' (পৃ.৬০/১ম খণ্ড) তবে শশীবালার পরিণতি উপন্যাস থেকে জানা যায় না। দেশভাগের পর তিনি পুত্রদের হাত ধরে নিশ্চয়ই চলে এসেছিলেন ভারতে, কিন্তু তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই উপন্যাসে। আমরা জানতে পারি না কী হলো তাঁর শেষপর্যন্ত। মৃত স্বামী এবং নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্রের স্মৃতিবহ দেশ ছেড়ে যেতে শশীবালার বেদনার কোথাও উল্লেখ নেই।

বড়বৌ-এর যখন বিবাহ হয়, মণীন্দ্রনাথ তখনো পাগল হয়ে যান নি। প্রেমের ব্যর্থতা তাঁকে অশান্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু মাথা খারাপের লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পায় নি। বিয়ের পরও মণীন্দ্রনাথ কাজ করতে গিয়েছিলেন। 'পাগল হয়ে যাবার অব্যবহিত আগের ছ'মাস বড়বৌ-কে তিনি ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন, চিঠি লিখেছেন বড়বৌকে — সেই চিঠিই বড়বৌ-এর একমাত্র সম্বল, তার দুঃখের সান্ত্বনা, কষ্টের সাথী। বড়বৌ কলকাতায় বড়ো হয়েছে, কিছুদিন কনভেন্টে পড়েছে। এই সূত্রে তারও চোখের সামনে ভাসতে থাকে স্বপ্নের মত দৃশ্য — একটা চার্চ, সবুজ মাঠ, একজন প্রসন্ন ফাদার — আর তাতে সে ছুটছে, ছুটছে। বড়বৌ-এর মুক্তির স্বপ্ন। স্বামীকে তার পাগল বলে মনে হয় না — স্বামী তার কাছে যেন প্রায় মোজেসের মতো অথবা কোনো গ্রিক পুরাণের বীর নায়ক — যুদ্ধক্ষেত্রে যে হেরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বড়বৌ জানে তার পাগল ঠাকুর যাকে ভালোবেসে পাগল — সে একজন বিদেশিনী তরুণী। তবু সে কখনও অভিমান করে না, দুঃখকে জীবনের স্বাভাবিক প্রাপ্য ভেবে সে ইদানীং নিজের জন্য আর ভাবেই না — নিরুদ্দিষ্ট মানুষটার জন্য রাতে তার ঘুম আসে না, কেবল জেগে বসে থাকে মানুষটা কখন ফিরবে। অবুঝ স্বামীর কানে বারবার বলতে থাকে বড়বৌ, সে তাকে একদিন পলিনের কাছে পৌঁছে দেবে — শুধু মণীন্দ্রনাথ ভালো হয়ে উঠুন, সেরে উঠুন। মনের অসহনীয় দুঃখকে চেপে রেখে সে নীরবে সংসারের কাজ করে গেছে — তার দুর্ভাগ্যের জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি দায়ী সেই মহেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে।

এ উপন্যাসের আর এক বধূ-চরিত্র — ধনবৌ, স্বামী সোহাগিনী লাল্টু-সোনা-ছবির মা। পূর্ববাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম্য বধূ সে। সংসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছেলেদের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেলে বৎসরান্তে একবার বাপের বাড়ি যায়। বড়বৌ-এর মতো

দুর্ভাগ্য তার জীবনে ঘটে নি, স্বামী এবং ছেলেদের নিয়েই সে সুখী। সোনা প্রথম মাকে ছেড়ে বাইরে গেলে বুকটা তার ফাঁকা হয়ে যায়। সোনা যে তার পাগল জ্যাঠাকে খুঁজতে গিয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় — এটা তার পছন্দ নয়। বড়বৌকে এজন্য সে কথাও শোনাতে ছাড়ে না। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে এলে তার স্বামীই হয় মূলত পরিবারের কর্তা — সেই হিসাবে সেও কর্ত্রী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। নিত্য দারিদ্র্য, দুঃসহ বেদনা, উপর্যুপরি আরো দুই সন্তানের জন্ম ধনবৌর জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করেছে। সোনা দেখেছে — 'মা রাতে কাঁথার ভিতরে শুয়ে কষ্ট পান। শিয়রে একটা কুপি জ্বলতে থাকলে সোনা টের পায় মার চোখমুখ কতটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।' (পৃ. ২৮৩/২য় খণ্ড) উল্লেখযোগ্য, ঠাকুরবাড়ির সূত্রেই বড়বৌ এবং ধনবৌ-এর পরিচয়। তাদের নিজস্ব নাম বা কোনো ব্যক্তিপরিচয়ের দৃষ্টান্ত এখানে নেই। আসলে তৎকালীন পরিবেশে বাংলাদেশের গ্রাম্যবধূর আর কোনো পরিচয় থাকতে পারত না। সেদিক থেকে এই চরিত্রদুটি একেবারেই প্রতিনিধিত্বমূলক।

রাইনাদীর ঠাকুর-পরিবারের বাইরেও এ উপন্যাসে আরও অনেকগুলি নারীচরিত্র আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালতী। হিন্দুসমাজ যে তার অনুশাসন নিয়ে কত কঠোর, নরেন দাসের বোন মালতীকে দেখলে তা বোঝা যায়। ঢাকার রায়টে তার স্বামীর মৃত্যু হলে সে বাপের বাড়ি ফিরে আসে। বোম্বা গাছের নীচে দাঁড়ানো মালতীর নিঃসঙ্গতা আমাদের পীড়িত করে। 'একাদশীর পরদিন, বেশ ঝালটাল খেতে ইচ্ছা' জাগে তার। সুগন্ধী আতপচাল, সামান্য ঘি আর বেতের ডগা সেদ্ধ বৈধব্য-দশার পরম আস্বাদ্য ভোজ্য বলে যখন সে ভাবছে, তখন তার দাদা বড় বড় 'ইচা মাছ' নিয়ে এসে ভাতের সঙ্গে সিদ্ধ দিয়ে খেতে সবুর করছে না। তার তরুণী শরীর বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন মানতে চায় না — 'শরীরে কি যে এক কোড়াপাখি আছে — সময়ে, অসময়ে কেবল ডাকে, সারারাত তখন ঘুম আসে না মালতীর। পুকুরে পুরুষ হাঁসের অন্য হাঁসগুলিকে তাড়া করার দৃশ্য দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে যায় 'যেমন তার মানুষ তাকে ছুটে ছুটে ঘরের ভিতর অথবা বাগানের ভিতর এবং রাত অন্ধকার হলে লুকোচুরি খেলা — ছুঁই ছুঁই খেলা' খেলত, সেসব কথা। অথচ মালতীর সব ছিল। সামুর মত বন্ধু ছিল, ছিল রঞ্জিতের মতো সাথী, নরেনের মতো দাদা, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে হলো বিধবা। এই তরুণীর চারপাশে প্রলোভন, তার সৌন্দর্যই তার শত্রু। এই মালতী একদিন লুণ্ঠিত হলো, ধর্ষিত হলো। গর্ভে অনাহূত সন্তান নিয়ে যখন সে ফিরে এল, তখন আদরের বোনটির জন্য নরেন হাঁসের ঘরের মতো ছোট খুপরি বেঁধে দিল। স্বাভাবিক জীবনে তার আর কোনো অধিকার রইল না। রঞ্জিত শেষ পর্যন্ত তাকে সেই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। জোটনের কাছে আশ্রয় নিয়ে সে গর্ভপাত করিয়েছে। এরপর উপন্যাসে তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি। আমরা যখন আবার তার দেখা পাই, সে তখন দেশভাগের শিকার, রঞ্জিতকেও ততদিনে সে চিরকালের মতো হারিয়ে জীবিকার দায়ে পরিণত হয়েছে চোরাচালানকারী দলের একজন সদস্যে। তখন সে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি, ততদিনে সব স্বপ্ন মুছে গেছে তার জীবন থেকে।

* এ উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রতিবেশী সমাজের রীতিনীতি সংস্কার সুখদুঃখের ধারা সমান্তরাল ভাবে বয়ে গেছে। হিন্দু সমাজের তুলনায় মুসলমান সমাজে মেয়েদের অবস্থান অনেকটাই ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। জোটন, জালালি, আন্নু, মাইজলা বিবি — তাদের সুখদুঃখ অধিকার-অনধিকার নিয়ে জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। চারবার তালাক-পাওয়া তেরটি

সন্তানের জননী জোটন পঞ্চমবার স্বামীর ঘর করতে চায়। 'গতরে খোদার মাশুল উঠছে না' বলে সে কাতর। দীর্ঘ উপবাসেও সে শ্রান্ত। ফকির সাহেবের সঙ্গে নিকাহ্ বসতে চায় সে — এই স্বাধীনতা তার সমাজ তাকে দিয়েছে। ফকির সাহেব জোটনকে নেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচ বছর হলো পীরের দরগায় সিন্নি চড়াতে গেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষার পর জোটন যখন অনাহারে অভাবে নিঃস্ব, ফকির ফিরে এলেন, জোটন চলে গেল ফকিরের পিছন পিছন, বিচিত্র আরণ্যক পরিবেশে ঘরও বাঁধল নতুন করে। কিন্তু এ সংসারও দীর্ঘস্থায়ী হল না। ফকির সাহেবের ওলাউঠায় মৃত্যু হলে জোটন পীরানি হয়ে যায়, আর সে ফিরে আসে না ভাই আবেদালির কাছে। বলতে পারে অনায়াসে — 'সকলে আমার আপনজন কর্তা। কিন্তু কোনো মায়া নাই।' (পৃ. ২৮/দ্বিতীয় খণ্ড)

আন্নুর প্রথম স্বামী বুড়ো আলতাফের গলাটা এক কোপে নামিয়ে দিয়ে তাকে নিকাহ্ করে এনেছিল ফেলু শেখ। সেই ফেলু যখন পঙ্গু হয়ে গেল, আন্নুর ভাব হলো আকালুদ্দিনের সঙ্গে। সুন্দরী যুবতী আন্নু পঙ্গু অসহায় স্বামীকে পরিত্যাগ করে পালাল আকালুর সঙ্গে। তাদের সমাজে বৈধব্য বা বৈধব্যজনিত বেদনা — কোনটাই নেই। কিন্তু এর একটা উলটো দিকও যে আছে, তা হাজিসাহেবের 'মাইজলা বিবি'-কে দেখলে বোঝা যায়। ইসলাম ধর্ম মুসলমান পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তালাক না পেলে কোনো মুসলিম নারী তার ভালোবাসার পুরুষকে পায় না। আন্নুর স্বাধীনতাও এখানে আটকে ছিল — ফেলু তাকে তালাক দিচ্ছিল না বলেই সে আকালুর ঘরে উঠতে পারছিল না। তাকে পালাতে হলো। কিন্তু যে নারী পালালো না সেই 'মাইজলা বিবি'কে রাতের অন্ধকারে কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে লুকিয়ে যেতে হল ভালোবাসার মানুষের কবরে আলো জ্বেলে দিতে।

উপন্যাসের আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র রঞ্জিত। পিতৃমাতৃহীন কিশোর রঞ্জিত বড় বৌ-এর ছোট ভাই। রাইনাদীতে সে দিদির বাড়িতে থাকত। মালতী আর সামু বা সামসুদ্দিন তার খেলার সাথী। ছোটবেলায় একটা অন্যায় করে সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তারপর দীর্ঘদিন সে অনুপস্থিত। বড়বৌ-এর কথা থেকে জানা যায় সে দেশের কাজ করছে। চিঠি সে দেয়, কিন্তু ঠিকানা থাকে না। তারপর একদিন যুবক রঞ্জিত ফিরে আসে, আত্মগোপন করে থাকে দিদির বাড়িতে। সে ছেলেদের লাঠিখেলা শেখায়, শেখায় আত্মরক্ষার কৌশল। বিধবা মালতীর সঙ্গে তখন আবার দেখা হয় তার। মালতী তাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখে, কিন্তু রঞ্জিতের চোখে তখন অন্য আদর্শের স্বপ্ন। ইতিমধ্যে মালতীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জব্বর। কিছুদিন পর অন্তঃসত্ত্বা মালতী যখন আত্মহননের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে, রঞ্জিত তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তখন সে পালাতে উদ্যত। কিন্তু তখনও সে মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখে। "অভুক্ত এবং ভূমিহীন মানুষ, ভূমিহীন বলতে পায়ের নিচে মাটি নেই এমন মানুষ সে ভাবতে পারে না। তার ঘর থাকবে, চাষ-আবাদের জমি থাকবে, সে কিছু খাবে, খেতে পাবে, খেতে না পেলে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ হয় না। মানুষের স্বাধীনতা বলতে সে এই বোঝে। তার কেন জানি এবার মনে হল, সে একখণ্ড জমি মালতীকেও দেবে। (পৃ. ৩৮৩/১ম খণ্ড)

মালতীকে এই একখণ্ড জমি দেবার জন্যই রঞ্জিত দেশের কাজ ছেড়েছিল, অন্তঃসত্ত্বা মালতীকে গ্লানির হাত থেকে বাঁচাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছিল জোটনের আশ্রয়ে। তারপর উপন্যাসে দীর্ঘসময় আর তার কোনো খবর পাওয়া যায় না সরাসরি। অনেক পরে মালতীর

ভাবনা থেকে আমরা জানতে পারি — দেশভাগের সময় রঞ্জিতও ভারতে এসেছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন অসুখে ভুগে ভুগে তার মৃত্যু হল। মালতী ভাবে — "মরে গেল না কেউ মেরে ফেলল ওকে, সে বোঝে না। মানুষটা তার আদর্শ ছেড়ে দিতেই আর বড়মানুষ থাকল না। ক্ষীণকায় হয়ে গেল। বাঁচার সব উৎসাহ নিভে গেল। তবু সে মানুষটাকে সারাক্ষণ স্বামীর মতো আদরযত্ন করেছে। রঞ্জিত কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তাকাত তখন। তুমি আমাকে মুক্তি দাও মালতী। এমন একটা চোখমুখ ছিল তার। মুক্তি তাকে দিতে হয় নি। রঞ্জিত নিজেই এ-পারে এসে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেল!" (পৃ. ২৫৮/ ২য় খণ্ড) তার দেশপ্রেম, দেশের জন্য কাজ, মালতীকে দেশের বাড়া সম্মান দেওয়া — সমস্ত কিছুর অবসান হল তার ব্যর্থ মৃত্যুতে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সামসুদ্দিনের কথা। সেও মালতীর দুঃখের অংশীদার হতে চেয়েছিল। নানারকম দুঃসাহসিক কাজকর্মে সামু মুগ্ধ করার চেষ্টা করেছে মালতীকে। মালতীর দাদা নরেন দাস মালতীকে তাদের সঙ্গে খেলতে নিষেধ করলে রাত জেগে চিংড়ি মাছ ধরে ঝুড়ি করে সে পৌঁছে দিয়েছে নরেন দাসের বাড়িতে। কারণ 'ইচা' মাছ খেতে সে খুব ভালবাসত। শৈশবে মালতী সামুকে দিয়ে ঝোপজঙ্গল থেকে চুকৈর ফল আনিয়েছে, বেতলা ফল আনিয়েছে অথবা শাপলা-শালুকের দিনে নানারকম ফুলফল। কারণ সামু বাস্তবিকই ছিল মালতীর বশংবদ। তারপর মালতী যখন বিয়ের পর ঢাকায় স্বামীর ঘর করতে গেছে, তখনও ঢাকায় সে মালতীদের বাড়িতে গেছে। বৌদি আভারানীকে মালতী বলেছিল — 'সামু অর মামার বাসায় থাইকা পাশ দিল। তোমাগ জামাইর কাছে কত দিন ঘুরছে একটা চাকরির লাইগা।' (পৃ. ৩৫/১ম খণ্ড) ঢাকার দাঙ্গায় মালতীর স্বামীর (নাম অনুল্লিখিত) মৃত্যু হলে সে যখন বাড়ি ফিরে এল — সামু তখন মুসলিম লীগের পাণ্ডা। মালতীর চোখের দিকে তখন সে তাকাতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় তার বাল্যসাথী মালতীর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে — এজন্য সামু অপরাধবোধে ভোগে। জব্বর মালতীকে হরণ করে নিয়ে গেলে সামু আক্রোশ চেপে রাখতে পারে না। পরে রঞ্জিত মালতীকে নিয়ে চলে গেলে সে হতাশ হয়। মালতীর সম্পর্কে তার দুর্বলতা আজীবন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও 'এই এক যুবতী তাকে বারেবারে কোথাও টেনে নিয়ে যায় — বুঝি সেই শৈশবকাল, ধানখেত এবং পাটখেতের আল অতিক্রম করে বকুল ফুল কুড়াতে যাওয়া।' কলেজে-পড়া মেয়ে ফতিমাকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে — 'তর মালতী পিসি কি এ দ্যাশে আছে! হিন্দুস্তানে গেছে গিয়া! সোনার দ্যাশ, সোনার সিংহাসনে রাজরানী হইয়া বইসা আছে।' (পৃ. ২৫৫-২৫৬/২য় খণ্ড)

সামসুদ্দিন ঢাকায় পড়তে গিয়ে মুসলিম লীগে নাম লেখায় — ধীরে ধীরে টোডারবাগ এবং সংলগ্ন এলাকার লীগের অন্যতম নেতা হয়ে দাঁড়ায় — 'ঢাকা থাইকা আইসা সামু আমাগ লীগের পাণ্ডা হইয়া গ্যাল'। (পৃ. ১৯/১ম খণ্ড) সামু শিক্ষিত মানুষ, সে বুঝতে পারে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মালতী লীগের ইস্তাহার ছিঁড়লে সে বলেছে — 'এডা করলি ক্যান?

— ক্যান করুম না। দেশটা কেবল তর জাতভাইদের?

— ক্যান আমার জাতভাইদের হইবে। দেশডা তর আমার সকলের।

— তবে কেবল ইসলাম ইসলাম করস ক্যান?

— করি আমার জাতভাইরা বড় বেশি গরু ঘোড়া হইয়া আছে।

— একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ, চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারী তগ, শিক্ষাদীক্ষা সব হিন্দুদের।' (পৃ. ৩৬/১ম খণ্ড)

এর কয়েকমাস পরে মালতী দেখেছে — 'সামু ওর কার্তিক ঠাকুরের মতো গোঁফ চেঁচে ফেলে গোটা গালে মৌলবী-সাবের মতো দাড়ি রেখেছে।' (পৃ. ৪২/১ম খণ্ড) বোঝা যায় ঢাকার নেতাদের গরম-করা বক্তৃতা সামসুদ্দিনকে বাঙালি থেকে ক্রমশ মুসলমানের ক্ষুদ্র গণ্ডির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। লীগের রাজনীতি করার পক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে সে বলেছে — 'ওটা আমার ধর্মের কথা' (পৃ. ১৪৬/১ম খণ্ড)। জালালির কবরের ওপর ইস্তাহার বিছিয়ে দিয়েছিল সামসুদ্দিন — তাতে লেখা ছিল 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ'। 'যেন কবরে সাক্ষ্য হিসেবে ওরা ওদের শপথপত্র রেখেছিল। এই শপথপত্র কবরে মাটি ঝুরঝুর করে পড়ে না যাবার জন্য এবং গরীব মুসলমানদের বেঁচে থাকবার উত্তরাধিকারের দৌলতকে কেউ যেন অস্বীকার করতে না পারে; অথবা যেন সামুর বলার ইচ্ছা — চাচি, আমরা এই ফসল এবং মাঠ আমাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাব, আমরা এমন সব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। ধর্ম আমাদের সকলের ওপরে — রসুল আমাদের মহম্মদ, আল্লা এক — তার কোন শরিক নেই।' (পৃ. ২০০-২০১/১ম খণ্ড) পরে সামসুদ্দিন ঢাকায় চলে গেছে। পরাপরদিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সে বলেছে — 'এই যে আমরা, মুসলমানেরা আলাদা একটা দেশ চাই' (পৃ. ১১/২য় খণ্ড)। তার বক্তব্য 'হিন্দু-মুসলমান একই রাষ্ট্রে একই পতাকার নিচে বসবাস করতে পারে না'। অবশেষে সামসুদ্দিনের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি আসে। দেশভাগ হল — এল স্বাধীনতা — হল পাকিস্তান। কিন্তু এটাই কি তার সেই স্বপ্ন — এমন খণ্ডিত, বীভৎস? কায়েদ-ই-আজম স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্বাংশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন — উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। চিৎকার করে উঠেছিল সামসুদ্দিন — ' না। তা হবে না। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না।' (পৃ. ২৫৩/২য় খণ্ড) আবার বেজে উঠল যুদ্ধের ভেরী, পঞ্চাশ সালের ভাষা-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল সে, এল বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। সামসুদ্দিন ধর্মের সংকীর্ণ বোরখা খুলে রেখে উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়ালো সসম্মানে তার বাঙালি পরিচয় নিয়ে। তার মাথায় তখন আর মুসলমানী ফেজ নেই, আছে আম-জাম পাতার মুকুট। বহু বাঙালি মুসলমান যুবকেরই স্বপ্নভঙ্গ হয় পাকিস্তান হবার পর। তারা বুঝতে পারে, ধর্মের থেকেও দেশ অনেক বড়ো। সামসুদ্দিন এই মানুষদেরই প্রতিনিধি। তার স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, নতুন করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি — শেষে অখণ্ড বাংলার জন্য গভীর দুঃখ সামসুদ্দিন চরিত্রকে একটা বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

সামসুদ্দিনের একমাত্র সন্তান ফতিমা। গ্রামবাংলায় কেটেছে তার শৈশব। ছোটবেলা থেকেই তার কাছে গভীর আকর্ষণ ছিল সোনাবাবুর। সোনাবাবু, অর্জুন গাছ, গোপাট, পীরসাহেবের দরগা, লটকন ফল, কচুপাতায় প্রজাপতি — এসবের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে তার শৈশব। ফতিমা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সোনাকে। সে জানে সে ছুঁয়ে দিলে অশুচি হবে সোনাবাবু, তবু তাকে ভালো না বেসে সে পারে না। সোনাবাবুর গায়ে সে চন্দনের গন্ধ পায়। এই ফতিমা কৈশোর সূচনাতেই পড়াশোনা করতে চলে যায় ঢাকায়, স্কুলের ছুটির অবসরে মাঝে মাঝে আসে রাইনাদিতে, ধীরে ধীরে সে বেড়ে ওঠে। দেশভাগের পর সোনারা 'হিন্দুস্তান'

চলে গেলে ফতিমা আর দেশের বাড়িতে আসতে চায় না। ততদিনে তার বন্ধুত্ব হয় সফিকুরের সঙ্গে, হৃদ্যতা পৌঁছয় আরও গভীরে — তারও অতলে থাকে সোনার ছবি। মনে মনে কথা বলতে বলতে ফতিমা সোনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে — 'তুমি যে আমার কে, বুঝতে পারিনা। তুমি আমার কি যে নও মাঝেমাঝে আবার তাই ভাবি। যখন আমি মরে যাব, কবরের নীচে চলে যাব বুঝি তখন দেখব তুমি আমার কবরের পাশে বসে আছ। তুমি আছ আমার পাশে পাশে। তুমি বাদে আমি এ-বাংলাদেশে সব থাকলেও একা।' (পৃ. ২৭৯/২য় খণ্ড) দেশে ফিরে এসে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, অর্জুন গাছের কাণ্ডে জ্যাঠামশায়ের উদ্দেশে লিখে-যাওয়া সোনার বার্তা ফতিমার চোখে পড়ে — 'আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি', সে কেঁদে ফেলে। ততদিনে তার প্রেমিক সফিকুর একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত, সোনা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ফতিমার জীবনের নীলকণ্ঠ পাখিরা উড়ে গেছে নিরুদ্দেশে।

সোনার মাধ্যমেই লেখক উপন্যাসের কাহিনীকে মূলত এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সেই অর্থে সোনা-ই এ উপন্যাসের নায়ক। সোনার জন্ম ঘোষণায় উপন্যাসের শুরু। সোনার জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন উপন্যাসের দুখণ্ড জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের মূল কাহিনী যে পরিবারকে আশ্রয় করে কেন্দ্রীভূত, সোনা সেই পরিবারের অন্যতম সদস্য — সবার প্রিয়, আদরণীয়। আশৈশব সোনা অত্যন্ত বাধ্য, তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। বাড়ির বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ পাগল, কিন্তু এই পাগল ঠাকুরই সোনার একান্ত আপন, যেন তার নিজস্ব সম্পত্তি। জ্যাঠামশাইকে কেউ পাগল বললে সে রেগে ওঠে 'হ, হ, কইছে। পাগল কে কইছে।' সে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখে দিতে চায় তার জ্যাঠামশাইকে। তাঁর দুঃখের কারণ সে বুঝতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করে। বাবা তার কাছে রূপকথার দেশের মানুষ, মা যে তার কী, সে বলে বোঝাতে পারে না। তার মনে হয় মা তার চুলের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারেন — সে কোনো পাপ করেছে কি না। রঞ্জিত মামাকেও তার আশ্চর্য এক মানুষ বলে মনে হয়। আর তার ভাব ফতিমার সঙ্গে। ফতিমার সঙ্গেই সে পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে যায়, নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়ায় — রাইনাদীর গাছ-ফুল-পাখি সব চেনে — তার সঙ্গে বকুল ফল আনতে যায়। ঈশমের কাছে গল্প শুনতে শুনতে সে বড় হয়। বাল্য আর শৈশবের সন্ধিক্ষণে সোনা তখন একদিন মুড়াপাড়ায় অমলার সঙ্গে একটা 'পাপকাজ' করে ফেলল। তারপর তার নিত্য ভয়। একদিকে অমলার মায়াবী সৌন্দর্যের প্রতি সোনার আকর্ষণ, অন্যদিকে বাল্যসঙ্গিনী ফতিমার সোনার প্রতি টান। ফতিমার পূজা এত নীরব, নিভৃত, নিশ্বাসের মতই এমন সহজ স্বাভাবিক যে সোনা কোনোদিন বুঝলই না যে ফতিমা তাকে ভালোবাসে। ঢাকা থেকে ফিরলেই ফতিমা ছুটে আসে সোনাবাবুর কাছে — অসময়ের লাটকন ফল জোগাড় করে এনে দেয় তাকে — সোনার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে লজ্জিত হয়। অথচ সোনা তার দুঃখ বোঝে না, বোঝে না তার অভিমান। অনায়াসেই বলে বসে — 'তর অবার কান্দনের কি হইল।' ছোটবোন ছবির জন্মসূত্রে সে জেনে যায় ঈশ্বর কোনো অলৌকিক উপায়ে ছেলে মেয়ে দিয়ে যান না — বোয়াল মাছের ডিম পাড়ার মতোই জন্ম হয় মানবসন্ততির। এভাবে সোনার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। সময় হয়ে আসে তাদের পূর্ববাংলা ছেড়ে যাবার। পাগল জ্যাঠামশাইকে শেষপর্যন্ত আর খুঁজে পায় না সে। নিরুদ্দিষ্ট মানুষটার জন্য ছুরি দিয়ে অর্জুন গাছের কাণ্ডে সে লিখে রেখে যায়, তার ঠিকানা — 'জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি।' (পৃ. ২৪০/২য় খণ্ড) তারপর আরো প্রায়

পাঁচ বছর সময় কেটে যায়। ততদিনে সে ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কোর্সে ট্রেনিং নিয়ে ভদ্রা জাহাজে কাজ করতে চলেছে। কারণ এপার বাংলায় আসার পর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দেয়। 'অন্নহীন এই সংসারে সোনার নিজেকে বাড়তি লোক বলে মনে হয়।' (পৃ. ২৮৪/২য় খণ্ড) সোনা ভাবে — 'সে জাহাজে যখন চড়ে বসবে তখন সবাইকে চিঠি লিখবে। লিখবে, অমলা আমি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি' (পৃ. ২৮৪-২৮৫/২য় খণ্ড)। বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময়ও সোনার অমলার কথাই মনে পড়েছে — ফতিমা তার স্মৃতিতে কোথাও উঁকি দেয় নি। সোনা জাহাজে চাকরির ট্রেনিং নেয় অর্থকষ্ট ও অন্নকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কারণ সে জানে, শিক্ষানবিশী পর্বে সে হাতখরচ পাবে সাতটাকা। তাছাড়া দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবে। অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে খাবার হিসাবে দুপুর বেলায় পাবে বড় বড় কলাই-করা থালাতে ভেড়ার মাংস আর ভাত। এই কাজে তাকে ভুলতে হবে ব্রাহ্মণত্বের গর্ব, শুনতে হবে অনেক অসম্মানজনক কথা — তবু সে নিরুপায়। সোনা চরিত্র নির্মাণে লেখক সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। চরিত্রটির বিকাশপদ্ধতিতে 'পথের পাঁচালী'র অপুর কথা মনে পড়তেই পারে। কিন্তু কোথাও কোথাও লেখকের অসাবধানতা নজরে পড়ে। সোনার জন্ম সম্ভবতঃ ১৯৩০ বা ১৯৩১ সালে ঢাকার রায়টের সময়। কিন্তু দেশত্যাগের সময় তার ব্যবহারে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে সে ষোল-সতেরো বছরের তরুণ। উপন্যাসের অনেক দূর পর্যন্তই সোনার আচরণ বালকসুলভ। উপন্যাসে ঘটনার এমন পারম্পর্য নেই যার থেকে সোনার জন্মপরিণতি স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুত ফতিমার স্কুলে পড়া কলেজে-পড়া-এসব ঘটনা থেকেই সোনার বয়স অনুমান করে নিতে হয়।

এ উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র — ঈশম। সে ঠাকুরবাড়ির বাঁধা লোক — আগে ছিল গয়নার নৌকার মাঝি। বড়কর্তা মণীন্দ্রনাথ পাগল হয়ে দেশে ফিরলে তাঁর নৌকায় কিছু বিদেশী লতা পাওয়া গিয়েছিল — তার ভিতর একটা লতাকে সে শশার চারা ভেবে একটা পবিত্র জমিতে লাগিয়েছিল। দেখা গেল সেই অচেনা লতাটা আসলে তরমুজের চারা। তারপর থেকে বছরের পর বছর সেই মাটিতে সে তরমুজের চাষ করেছে। ঘরে তার পঙ্গু বিবি — তবু সে দুঃখে ভারাক্রান্ত না হয়ে ঠাকুরবাড়ির সুখদুঃখময় জীবনের শরিক হয়েছে। সামসুদ্দিনের 'লীগের পার্টি' করা তার পছন্দ হয় নি। সে বোঝে — দেশভাগ হলে, এ দেশটার নাম পাল্টে যাবে। পাকিস্তান হবে।

> 'বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান — ঈশমের কষ্ট হয় ভাবতে। তার একটা অংশ হিন্দুস্থানে চলে যাবে। এটাও ওর মনে কেমন একটা দুঃখের ছাপ বহন করছে। এতবড় বাংলাদেশের নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। এটা সামু করেছে। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হলে যেন সে বলত, কি লাভ তর, দেশটারে ভাগ করে দুই দেশের কাছে ইজারা দিলি!' (পৃ. ২৩৩/২য় খণ্ড)

এক কথায় ঠাকুরবাড়ির লোকেরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে ভাবে নি সে — 'কেমন একটা ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল ওর মনে'। (পৃ. ২৪৪/২য় খণ্ড) শেষে সে ভেবেছে — 'কি সুখ হে পারে জানি না আল্লা। এমন সোনার দ্যাশ ফালাইয়া পাগল না হইলে কেউ যায়।' পাগলের মতো তরমুজের খেত থেকে মাটি তুলতে তুলতে সে ভেবেছে — 'এই মাটি কার? এই ভালবাসার মাটি কার? সে কে?' (পৃ. ২৪৪/৩য় খণ্ড) দেশভাগ শুধু হিন্দুদেরই উদ্বাস্তু করে নি

— উদ্বাস্তু করেছিল সেইসব মুসলমান চাষীদেরও যারা দীর্ঘদিন ধরে সম্পন্ন হিন্দুদের 'বাড়ীর লোক' ছিল। জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে থাকলেও, জমির সর্বময় কর্তা ছিল এই মুসলমান কামলারাই।

যে স্বপ্ন সামসুদ্দিন দেখেছিল, যে স্বপ্ন দেখার আবেগে জালালির কবরে পাকিস্তানের ইস্তাহার রেখে ভেবেছিল — 'আমরা এইসব ফসল এবং মাঠ আমাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাব, আমরা এমন সব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি', সেসব স্বপ্ন দরিদ্র মুসলমানদের কাছে সত্য হয়ে দেখা দেয় নি। সম্পন্ন হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে দরিদ্র চাষীরাও জমির ওপর তাদের অধিকার হারিয়ে ফেলল পাকিস্তান তাদের কাছে শুধু দুঃস্বপ্ন বয়ে নিয়ে এল। তাই দেশ ছেড়ে যাবার সময় ঈশম যতক্ষণ পেরেছে সোনাদের নৌকার পাশাপাশি হেঁটেছে। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে পড়েছে নৌকা — কাগজের নৌকার মত ছোট্ট হয়েছে, শেষকালে দামোদরদির মাঠ পার হলে সামনে বড় বাঁওড় পড়তে সে আর এগোতে পারল না। প্রিয়জনেরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু জমির টান বড় টান — আবার সে ফিরে এল বিবির মৃত্যুর পর তার নিজের ইন্তেকালের সময় হলে। তার অতিপ্রিয় তরমুজের খেতে এসে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। ততদিনে মিথ্যা মোহ কাটিয়ে উঠেছে সামসুদ্দিন, সে বুঝেছে ধর্ম না, দেশ সকলের বড়, সবচেয়ে প্রিয়। হাজী সাহেবের কাছ থেকে একখণ্ড জমি চেয়ে নিয়ে সেই তরমুজের খেতেই ঈশমকে সমাধিস্থ করেছে সামু।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তিমানুষের গল্প নয়, নয়, কোনো বিশেষ পরিবার বা লোকালয়ের গল্প। এ এক এমন দেশের গল্প, যার নাম বাংলা, যার আকাশ নীল, নদীর জল স্বচ্ছ, বাতাস ঠাণ্ডা, প্রকৃতির অকৃপণ দানে সে সমৃদ্ধ। এ গল্প পূর্ববাংলা আর তার মানুষের গল্প। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক শ্রী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে সেই বাংলাদেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের বিশেষত মুসলমান সমাজে দারিদ্র্য, অভাব, অন্নহীনতার অত্যন্ত বাস্তব চিত্র এখানে রূপায়িত হয়েছে আবেদালি, জোটন, জালালির নিয়ত জীবনসংগ্রামের মাধ্যমে। আমরা দেখি, অভাবী জোটন মাটির আলে কচ্ছপের ডিম খুঁজে বেড়ায় সেই ডিমের বদলে পশ্চিমপাড়ায় হিন্দুবাড়িতে গিয়ে তার বিনিময়ে এক টুকরি চাল পাবার প্রত্যাশা নিয়ে। দরিদ্র মানুষ এখানে ক্ষুধার জ্বালায় শালুক গিমাশাক সেদ্ধ করে খায়, অকালপক্ক বেথুন এনে খায়। শালুক খাওয়ার প্রসঙ্গে পাই এরকম চিত্র :

> 'বর্ষা শেষ বলে জল কমতে থাকলে শাপলা ফুল ফুটতে থাকলে মাটির নিচে অন্নের মত প্রিয় এই শালুক, দুঃখী মানুষদের, নিরন্ন মানুষদের একমাত্র সম্বল এই শালুক, বর্ষা এলেই মাটির ভিতর জন্ম নিতে থাকে। এই জলা জমি আর মাটির অন্তরে শালুক আপনার প্রিয় ধন — যেন ফেলতে নেই, অবজ্ঞা করতে নেই।' (পৃ. ১৫৯-১৬০/১ম খণ্ড)

অন্নাভাবে দারিদ্র্যের জ্বালায় হিন্দুবাড়িতে কাজ করতে গিয়েও দেখা দেয় বাদাবিসস্বাদ, তিক্ততা। তারও অত্যন্ত বাস্তবানুগত বর্ণনা পাই উপন্যাসে :

> 'গতকাল আবেদালির কোনো কাজ ছিল না। আজ সারাদিন হিন্দু পাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করতে পারে নি। এখন চৈত্রমাস। সব কিছুতে টান

পড়েছে। আবেদালি গৌর সরকারের শণের চালে নতুন শণ লাগিয়ে দিয়েছে। যা মিলবে — সামান্য যা কিছু। সে পয়সার কথা বলে নি। আবেদালি সারাটা দিন কাজ করেছে — যেহেতু কামলার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমান পাড়াতে রুজি রোজগার বন্ধ। যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত, অন্যবেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে। আবেদালির গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। গতর বেচে পর্যন্ত পয়সা হচ্ছে না। সারাদিন খাটুনির পর গৌর সরকারের সঙ্গে পয়সা নিয়ে বচসা হয়ে গেল। কুৎসিত গাল দিয়ে চলে এসেছে আবেদালি।' (পৃ. ৭৭/১ম খণ্ড)

অথচ পাশাপাশি দেখা গেছে ঠাকুরবাড়িতে তথা হিন্দু বাড়িতে প্রাচুর্যের ছবি। তাদের ঘরে দুর্গাপূজা, কার্তিক পূজা, মাঠে মাঠে বাস্তুপূজা। এছাড়া উপনয়ন এমনকি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও প্রাচুর্যের সমারোহ। আসলে এটা বাস্তব সত্য যে হিন্দুদের দ্বারা কোণঠাসা, অপমানিত, অপাংক্তেয় মুসলমান সমাজে বাংলাদেশেও মুসলিম লীগ সহজেই ঢুকে পড়তে পেরেছিল। জব্বর যখন তার বাপ আবেদালিকে বলে, 'হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু' (পৃ. ১৮/১ম খণ্ড) তখন সেটা নিষ্ঠুর হলেও সত্য বলেই মনে হয়। সোনা ফতিমার আঁচলে প্রজাপতি বেঁধে দিলে লালটু ধনবৌকে দিয়ে সোনাকে মার খাইয়েছে। ফতিমাকে দেখে মালতীর আবেগে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু জড়িয়ে ধরতে পারে না কারণ ফতিমা মুসলমানের মেয়ে, ছুঁয়ে দিলেই জাত যাবে। ছোট্ট বালিকা ফতিমাও জানে সেকথা, তাই সোনাকে সে বলে — 'সোনাবাবু, আপনেরে ছুইয়া দিচ্ছি। বাড়ি গেলে সান করতে হইব।' উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে লেখক হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সূক্ষ্ম জটিল টানাপোড়েনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

পূর্ব বাংলার গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতাকে এমন নিপুণভাবে এর আগে কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন কিনা ভেবে দেখার মতো বিষয়। হয়তো একমাত্র ব্যতিক্রম সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্। ছোট ছোট আচার অনুষ্ঠান — গাধার পিঠে ওলাওঠা দেবীর পুজো, বাস্তুপূজা, দুর্গাপূজায় মোষবলির ঘটনা, সোনাদের উপনয়নের কিম্বা মুমূর্ষু মহেন্দ্রনাথের চন্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান এখানে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও সোনার জন্ম উপলক্ষে আচার, পালেদের দুই মেয়ে কিরণী আবুর মাঘমণ্ডলের ব্রত, লাঙ্গলবন্ধে অষ্টমী স্নান, দশমী তিথিতে দশেরা উৎসব, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, পূজা উপলক্ষে রাবণবধের পালা, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, মেলা, ষোড়দৌড়, গোরুর দৌড় — এসবের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। অন্যদিকে মুসলিম আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জালালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ফকির সাহেবের বা ঈশমের অন্তিমকালের বর্ণনা, জোটনের নিকাহ্, হাতে পানিফলের মতো তিন মুখওয়ালা মুশকিল-আসানের লম্ফ নিয়ে ফকির সাহেবের পীরের দরগায় আলো দেখানো কিংবা ফেলুর কবরের অন্ধকারে হাজি সাহেবের মাইজলা বিবির মোমবাতি জ্বালানোর দৃশ্য। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এসব বর্ণনার মাধ্যমে।

পূর্ববাংলার নদীনালা খালবিল গাছপালা-লতাগুল্ম-ফলফুল-পোকামাকড় এসবকিছুর জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে আমাদের আলোচ্য এই উপন্যাসে। পেতি শাপলা-শাদা শাপলা-রক্ত শাপলা, চুকৈর বা বেথুন ফল, মোত্রাঘাসের জঙ্গল, শাড়ি-পরা পুঁটি মাছ, ডারকিনা মাছ, গরমা বা গজার মাছ, বৈচা বা মালিনী মাছ, সোনাপোকা, কোড়াপাখি, জালালি কবুতর, মটকিলা-

লটকন-ডেফল-গয়াগাছ-কড়ুই বা বোন্নাগাছ, সোনালি বালি, শীত লঙ্কা, নদীর চর ফাওশার খাল, 'বিশাল বিলেন মাঠ', 'গোলাকান্দালের ভুতুড়ে পুল', কোষা নৌকা — এই সব মিলিয়ে এক চিরন্তন দেশজ আবহ ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসে। সেদিক থেকে 'পথের পাঁচালী', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'কাঁদো, নদী কাঁদো', বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' এরই উত্তরসূরি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। নীলকণ্ঠ পাখির রূপকটি বারবার ফিরে এসেছে ঔপন্যাসিকের কল্পনায়। ঠাকুরবাড়ির বড়কর্তা পাগল মণীন্দ্রনাথ, নরেন দাসের বোন মালতী কিংবা সোনা — সকলেই তাদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য খুঁজে বেড়িয়েছে এই নীলকণ্ঠ পাখিকে — যা হয়তো জীবনের উদ্দেশ্য বা সফলতারই ইঙ্গিতবহ। উপন্যাসের শেষাংশে ঈশমের চোখেও সেই অন্বেষণ :

'ঈশম হয়তো গভীর রাতে তরমুজের জমিতে ফিরে আসতে চায়। ঈশম দেখতে পায় তখন তার নীলকণ্ঠ পাখিরা সব উড়ে গেছে কোথাও। হাতের তালিতে আর ওরা ফিরে আসছে না। ঠাকুরবাড়ির মানুষদের ওপারে বুঝি এতদিনে সেই পাখিটার খোঁজ মিলে গেছে।' (পৃ. ২৯৪/২য় খণ্ড) তেমনি সামসুদ্দিনের দৃষ্টিতেও সেই নীলকণ্ঠ পাখি অন্য ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। জীবনকে সেও এক ভিন্ন আদর্শে দেখতে চেয়ে আশাহত হয়েছে :

'দেশভাগের পর পরই সে ভেবেছিল, তবে বুঝি এবারে সব মিলে গেল — কিন্তু হায়, যত দিন যায় — সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে — আবার খুঁজে বেড়ায়। পেলে মনে হয় পাখি মিলে গেছে, দুদিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখিটা আর নীলরঙের নয়, কেমন অন্য রঙ হয়ে গেছে।' (পৃ. ২৯৪/২য় খণ্ড)

যে কোনো মহৎ উপন্যাসের মতোই এ উপন্যাসেরও দুটি প্রেক্ষিত — একটি দেশকাল সমাজ বিজড়িত বাস্তব প্রেক্ষিত, অন্যটি জীবন-মৃত্যু-প্রেম বিজড়িত দার্শনিক প্রেক্ষিত। উপন্যাসে বারবার এসেছে জন্ম আর মৃত্যুর ছবি। সোনার জন্ম দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত। তারপর তার ভাইবোনদের জন্মের দৃশ্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ধনবৌ-এর সন্তানপ্রসবের দৃশ্য। জীবের জন্মরহস্য যেভাবে বালক সোনার কাছে মাছ ধরার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তার সৌন্দর্য অনুপম। একদিকে জন্মরহস্য, অন্যদিকে একের পর এক মৃত্যুর ছবি — বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু, জালালির জলে ডুবে শোচনীয় মরণ, ফকির সাহেবের ওলাউঠায় মৃত্যু, ফেলু ও মণীন্দ্রনাথের অপঘাত-মৃত্যু, ঈশমের বিবির মৃত্যু এবং সবশেষে ঈশমের মৃত্যু — উপন্যাসের পাঠককে উদাসীন ও বিষণ্ণ করে দেয়। তবু জীবনের ধারা চিরপ্রবহমান। উপন্যাসের শেষে দেখি ঈশমের কবরে সামু নতুন এক ইস্তাহার লিখে রাখল। তার নাম বাংলাদেশ। নতুন এক উজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে শেষ হচ্ছে উপন্যাস:

'তারপর থেকেই মাঝে মাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরও বড় হচ্ছে। ডালপালা মেলে সজীব হচ্ছে।' এই সৎ আবেগ এবং আন্তরিকতাই 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে।

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে/অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধন চট্টোপাধ্যায়

মরা-আলোর সীমানায়*

শ্রাবণে শহরতলীর বিশাল মাঠটি দেখতে কেমন হয়, যদি দুপুরের শেষ-বর্ষণ ধরে যায়, রোদ বেরিয়ে সারা বিকেল একটি রূপকথা হয়ে ওঠে? বাঁশবাধা সীমানার ধারে-ধারে বসা-দাঁড়ানো শত শত ছুটির দর্শক একদিন-ফুটবল-ফাইনাল শুরুর জন্য কেবলই অস্থির, উসখুস করে? আলো মরতে থাকে চারধারে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে গুপ্ত-নিরালা থেকে, টুর্নামেন্ট-কর্তারা দু'দলকেই আবেদন জানায় মাঠে নেমে পড়তে, স্মরণ করায় 'আলো মরে যাচ্ছে — মরে যাচ্ছে — দলের জার্সি পরে নেমে পড়ুন' ... ইত্যাদি ইত্যাদি?

মাঠের দক্ষিণের গোলপোস্টটির পেছনে, ভিড়ের গাদাগাদি মাথাগুলো ছাড়িয়ে লম্বা ঝিলের জল অদ্ভুত শান্ত; ক্রমে মরা-আলোর ছায়া জমতে শুরু করে দিয়েছে ওখানে; তখন বল-বয়রা ঝপাং করে জল থেকে কুড়োবে কী করে?

দুই টিমের কেউ-ই তবু মাঠে নামছিল না। কেবল রেফারি, লাইনস্‌ম্যান মিলে, মোট তিন-চার জনের মতো, হাফ-প্যান্ট—কালচে গেঞ্জি গায়ে অসহায় নখ খুঁটছে বা মাঝেমধ্যে বাঁশি পিটিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের বিরক্তির ভাষা। ফাইনালে উঠেছে বলে এত পাঁয়তারা!

ঝকঝকে মস্ত শিল্ডখানা, ডি. আই. পি বৃন্দ, সিকি-খুচরো স্থানীয় নেতারা, চেয়ার-মাইক সহ উঁচু মাচাটা থেকে মিনিটে-মিনিটে বলা হচ্ছে 'দু-দলের কাছে অনুরোধ, নেমে পড়ুন! আপনাদের বলা হচ্ছে ...'

'আলো কমিয়া গেলে খেলা চালানো যাইবে না ... আমাদের অসুবিধাটুকু বুঝুন —'।

'দুই দলের খেলোয়াড়দেরই অনুরোধ, সহযোগিতা — ধৈর্য নিয়ে দর্শকের কথা ভাবুন। — অনেক অপেক্ষা করেছে তারা'!

---

*[একই চরিত্র-পটভূমিকাকে সামান্য মোচড় দিলেই যে আখ্যানে গড়ে ওঠে ভিন্ন সন্দর্ভ এবং নির্মিতি হয় নতুন যাত্রার গল্প — সে-সবেরই পরীক্ষায় 'মরা-আলোর সীমানা' 'মরা আলোর সীমানায়' এবং 'মরা আলোর সীমা'— তিনটি গল্প গত দু মাসে লিখেছি। ছাপা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায়। এই পরীক্ষা তৃতীয় বিশ্বে চলছে। পাঠকবৃন্দই এ-ব্যাপারে শেষ মতামত দেবেন। —লেখক]